BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120028

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মহিলা কবি : অর্পিতা কুণ্ডু

Ruma Mahata

Ph.D. Scholar, Department of Bengali, Midnapore College (Autonomous) under Vidyasagar University, Paschim Medinipur, West Bengal, Email: 1704ruma@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা জঙ্গলাকীর্ণ, কাঁকুরে-পাথরে মাটিই এর বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। এই কারণেই এই অঞ্চল দারিদ্র্যপূর্ণ। কৃষিকাজ সামান্য অঞ্চল জুড়ে রয়েছে, শিল্প প্রায় নেই বললেই চলে। যার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের প্রায় বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্রতার মধ্য দিয়েই জীবনযাপন করে থাকে। আমাদের আলোচ্য মহিলা কবি অর্পিতা কুণ্ডুর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের মানুষদের বাস্তব জীবনচিত্র। শূন্য দশকের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি অর্পিতা কুণ্ডু। যিনি মূলত ধ্রুপদী শব্দ ব্যবহার করে নতুন আঙ্গিকে কবিতা রচনা করেন।

সূচক শব্দ: *গাঙ্গেয়, মরাই, হিমহাড়, কিতকিত, রিকশা, বীণা।*

মূল আলোচনা:

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ভারতবর্ষের উৎপত্তির সময় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় প্রতি প্রদেশের নাম ও সীমার পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে যে ভূখণ্ডকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বলে থাকি, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে অনেক বেশি স্থান বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা— পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের আলোচ্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ভৌগোলিক সীমানা। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ভৌগোলিক সীমানা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা দেশের সীমা নির্ণয় করা যুক্তি যুক্ত নহে। মোটের উপর, যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলার উত্তর সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি পার্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন হিন্দু যুগেও এই সমুদয় অঞ্চলে একই ভাষার ব্যবহার ছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপাতত আর কোন নীতি অনুসারে বাংলাদেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে আমরা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকেই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করিব।"[১]

প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলার নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "কোনও স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা সর্বত্র সকল সময় এক না-ও হইতে পারে রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রসীমা প্রসারিত ও

সংকুচিত হইতে পারে, প্রায়শ হইয়াও থাকে; প্রাচীনকালে হইতো, এখনও হয়। প্রাকৃতিক সীমা, যেমন— নদনদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা নির্ধারণ করে সন্দেহ নাই; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, বর্তমানকালে রাষ্ট্রসীমা অনেক সময়ই প্রাকৃতিক সীমাকে অবজ্ঞা করিয়া চলে; বর্তমান যন্ত্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সেই অবজ্ঞার শক্তি দিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বর্তমান বাঙলাদেশের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ সীমা কোনও প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই। কোথায় যে বাঙলাদেশের শেষ, কোথায় যে বিহারের আরম্ভ, কোথায় যে মেদিনীপুর শেষ হইয়া ওড়িশার আরম্ভ, কোথায় যে ত্রিপুরা মৈমনসিং জেলা শেষ হইয়া শ্রীহট্ট জেলার আরাম্ভ বলা কঠিন।"[২]

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা জঙ্গলাকীর্ণ, কাঁকুরে-পাথরে মাটিই এর বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। এই কারণেই এই অঞ্চল দারিদ্র্যপূর্ণ। কৃষিকাজ সামান্য অঞ্চল জুড়ে রয়েছে, শিল্প প্রায় নেই বললেই চলে। যার ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের প্রায় বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্রতার মধ্য দিয়েই জীবনযাপন করে থাকে। যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। আলোচ্য কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপন।

প্রাচীন যুগে কী আধুনিক যুগেও এই অঞ্চলের মানুষজন সম্পর্কেও খুব বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করেননি কেউ। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গসূত্রে' বর্ণিত আছে রাঢ়বাসীদের রূঢ় আচরণের এবং বজ্জভূমিবাসীদের কুখাদ্য ভক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। এছাড়া 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' (অষ্টম শতক) গ্রন্থে গৌড় ও পুন্ড্রের ভাষাকে অসুরভাষা বলা হইয়াছে। গৌড়-পুন্ড্র-বঙ্গের অনার্য বা আর্যপূর্ব লোকেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ইঁহাদের জ্ঞান ছিল না, শ্রদ্ধা-ভক্তিও ছিল না।[৩] যার ফলে এই অঞ্চলে বার বার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কিংবা মাওবাদী আন্দোলন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাঢ়দেশবাসী হয়েও মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়দেশবাসীকে একটু রূঢ় এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক বলিয়াছেন। তিনি লিখেছেন— "লোকে না পরস করে সভে বলে রাঢ়।" আবার ঘনরাম চক্রবর্তীও তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়দেশের লোকেদের রূঢ় এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক বলেছেন। তিনি লিখেছেন—"জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।"

এই অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের কর্কশ, রূঢ়ভাষী, মাল, 'অষ্ট্র এশিয়াটিক' কখনও অষ্ট্রিক এই নামে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরা দরিদ্র হলেও খুব কর্মঠ প্রকৃতির হয়। এখানকার মাটি যত রুক্ষই হোক, বন-জঙ্গলে ভরা হোক, বেকারত্ব, দরিদ্র হলেও এরা এদের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। জীবনের প্রতি ভালোবাসাও এদের মধ্যে কোন অংশে কম দেখা যায় না। এ অঞ্চল সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লেখেন— "বীরভূমের কিছুটা অংশ, বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ (প্রধানত উত্তর মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা) এই রেখার পশ্চিম দিকে পড়ে। পশ্চিম বাংলা কেন, সারা বাংলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হল প্রাকৃতিক বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন।"[৪] আলোচক এও বলেছেন— "সিংভূম মানভূম থেকে আরম্ভ করে তার সংলগ্ন বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের এই অঞ্চলের প্রস্তরযুগের নানা ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে।"[৫] গবেষকরা মেনে নিয়েছেন এই অঞ্চলের বিস্তৃতি— "ঝাড়িখন্ড বা ঝাড়গ্রামের সীমানা যে এককালে ময়ূরভঞ্জ-উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বোঝা যায়।"[৬] এ অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা বোঝা যায় সমালোচকের দৃষ্টিতে— "জংলী ও বন্য যারা, রূঢ় স্বভাব যারা, তাদের 'ভদ্রসমাজে'র ভাষায় 'চোয়াড়' বা 'চুয়াড়' বলা হয়। এই চুয়াড় বিদ্রোহই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম গণ বিদ্রোহ এবং বাংলার পশ্চিম সীমান্তই সেই বিদ্রোহের ক্ষেত্র। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা যাই বলা হোক না কেন তাকে পরবর্তীকালে, তার জন্মভূমি পশ্চিম বাংলার জঙ্গলমহল। বর্তমানযুগের জাতীয়তার জন্মভূমির মধ্যে মেদিনীপুরও অন্যতম। কারণ জঙ্গলমহলের অনেকটা অংশ মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত।"[৭] মানভূম, সিংভূম, ধলভূম এবং মল্লভূম প্রভৃতি নিয়েই আমাদের আলোচ্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলটি। অঞ্চলটি মূলত আদিবাসী এবং অনার্য প্রধান। এর আর্যীকরণ হয়েছে অনেক পরে। এখানে যে যে সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তাদের মধ্যে প্রধান দুটি জনগোষ্ঠী হল— সাঁওতাল এবং মাহাত বা কুর্মী সম্প্রদায়। এছাড়া আছে ভূমিজ, মাহালী, বাগদী, বাউরী, মাল, হাড়ি, মুচি, ডোম, লোধা, খাড়িয়া, শবর, ভূঞ্যা, লোহার, কাহার, কুর্মী— এর মধ্যে সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে এখনও স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। এছাড়া মাহাত —যারা নিজেদের কুর্মী আদিবাসী বলে পরিচিতি দেয় তাদেরও ভাষা সংস্কৃতির ধারাটিকে মূল স্রোতের সঙ্গে যোগ করেও স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধির পথে বহমান— তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রসারে আজ সংগ্রামশীল। এছাড়া মধ্যবর্তী বেশ কিছু সম্প্রদায় আছে, যেমন— সদগোপ, চাষা, তিলি, বনিক, রাজু, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, দুলে, মাঝি, বাগাল প্রভৃতি।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলের কবিরা বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করলেও বেশির ভাগ কবিতাই আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় লিখেছেন বা লিখছেন। তাঁরা তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া অর্থাৎ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জীবন-যাপন ও সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন- "আঞ্চলিক উপভাষার কবিতা এখন আর কবিতার মানচিত্রে উপেক্ষিত অনাদৃত এবং কারও করুণাপ্রার্থী তপশিলী উপজাতি হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। বহু তর্ক-বিতর্কের সিঁড়ি পার হয়ে এ কবিতা আজ মানুষের মনে স্বমর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে। এদেশের জল হাওয়া মাটির গন্ধ মাখা এইসব কবিতার ধর্ম আলাদা চরিত্র আলাদা। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শব্দে ভাষায় কবিতাগুলি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সার্থক প্রতিফলন এই কবিতায় ঘটেছে।"[৮]

তিনি আবারও বলেছেন— "বাংলা ভাষাকে আরও বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে আঞ্চলিক ভাষাকে কাব্যে সাহিত্যে ব্যবহার করার কথা বহু ভাষাবিদ ও পন্ডিত গবেষকগণ বলে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জসীমুদ্দীন, বন্দে আলী মিঞা, নজরুল এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনো কোনো কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ প্রয়োগ করে কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী ও রসোত্তীর্ণ করে তুলেছিলেন। তাতে ওইসব কবিতার কোনো সৌন্দর্যহানি তো ঘটেই নি পরন্তু শব্দসম্ভার, প্রবাদ-প্রবচন, লোকগীতি ইত্যাদি থেকে মনিমুক্তা আহরণ করে বাংলা ভাষার সাহিত্যকে আরো পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব তো কবি সাহিত্যিকদেরই। গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত পল্লীতে এখনও লোক উৎসব, লোকনৃত্য, ব্রত, পাঁচালী আছে- আছে টুসু ভাদু ঘেঁটু করম ঝুমুর বাঁদনা প্রভৃতি লোকগানের মহড়া। ওইসব লোকসাহিত্য থেকে শব্দ নিয়ে পুরানো ঐতিহ্যকে নতুন সংস্কৃতির আলোকে রূপান্তরিত ও উজ্জ্বল করে তোলাই হচ্ছে আঞ্চলিক কবিতার বৈশিষ্ট্য।"[৯]

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এই অঞ্চলের পূর্ব অংশ সমতল ভূমি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ মালভূমি অঞ্চল। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলটির ভৌগোলিক সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা আমাদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। অবশ্য বলা যায় এই অঞ্চলের পরিচয় আমাদের কাছে নতুন নয়। আমাদের পূর্ববর্তী অনেক গবেষক তাঁদের গবেষণায় এই অঞ্চলের যে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা চিহ্নিত করেছেন, তাতে এখনও পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

অতঃপর আমরা আলোচ্য অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমার পরিচয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হবো। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা হলো মুলত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা। বর্ধমান জেলার কিছু অংশ ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ এর মধ্যে পড়তে পারে। তবে আমরা এই দুটি জেলাকে আমাদের আলোচনার মধ্যে আনিনা। কিন্তু অনিবার্যভাবে এর মধ্যে পড়ে ঝাড়গ্রাম জেলার সমগ্র অঞ্চল জামবনি, চিল্কিগড় থেকে শিলদা, বেলপাহাড়ি পার হয়ে সমগ্র বাঁকুড়া জেলা না হলেও তার বেশিরভাগ অংশই ও সমগ্র পুরুলিয়া জেলা। অন্যদিকে গোপীবল্লভপুর পেরিয়ে নয়াগ্রাম ধুমসাই এবং ময়ূরভঞ্জ বারিপাদা সহ সমস্ত অঞ্চল। গিধনি, চাকুলিয়া, ঘাটশিলা, রাখামাইনস সহ ঝাড়খণ্ডের এই অনেকখানি অংশ এর মধ্যে পড়ে। আবার হাতিবাড়ি বহড়াগোড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত।

এবার আমরা এই অঞ্চলের অন্তর্গত থানাগুলিকে উল্লেখ করবো।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার থানাগুলি হল—

১. কোতয়ালী, ২. আনন্দপুর, ৩.খড়গপুর টাউন, ৪. শালবনী, ৫. কেশপুর, ৬. খড়গপুর লোকাল, ৭. ডেবরা, ৮. দাসপুর, ৯. পিংলা, ১০. চন্দ্রকোনা, ১১. দাঁতন, ১২. কেশিয়াড়ি, ১৩. ঘাটাল, ১৪. সবং, ১৫. গোয়ালতোড়, ১৬. মোহনপুর, ১৭. বেলদা, ১৮. পটাশপুর, ১৯. গুড়গুড়িপাল, ২০. নারায়ণগড়।

ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত থানাগুলি হল—

১. ঝাড়গ্রাম, ২. লালগড়, ৩. বেলপাহাড়ি, ৪. বিনপুর, ৫. নয়াগ্রাম, ৬. গোপীবল্লভপুর, ৭. জামবনি, ৮. সাঁকরাইল, ৯. বালিবেড়িয়া।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত থানাগুলি হল—

১. রাইপুর, ২. রানিবাঁধ, ৩. সারেঙ্গা, ৪. সিমলাপাল, ৫. খাতড়া, ৬. হিড়বাঁধ, ৭. ইঁদপুর, ৮. তালডাংরা, ৯. বাঁকুড়া সদর, ১০. বাঁকুড়া গ্রামীণ, ১১. ছাতনা, ১২. গঙ্গাজলঘাটি, ১৩.শালতোড়া, ১৪. মেজিয়া, ১৫. বড়জোড়া।

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত থানাগুলি হল—

১. পুরুলিয়া সদর,২. পুরুলিয়া গ্রামীণ, ৩. কেন্দা, ৪. হুড়া, ৫. আড়ষা, ৬. বলরামপুর, ৭. বাগমুণ্ডী, ৮. মানবাজার, ৯. বোরো, ১০. পুঞ্চা, ১১. বরাবাজার, ১২.বান্দোয়ান, ১৩. কোটশিলা, ১৪. জয়পুর, ১৫. ঝালদা, ১৬. রঘুনাথপুর, ১৭. সাঁওতালডিহি, ১৮. সাঁতুরি, ১৯. নিতুড়িয়া, ২০. পাড়া, ২১. টামনা, ২২. আদ্রা।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানাগুলি হল—

১. বোলপুর, ২. বক্রেশ্বর, ৩. দুবরাজপুর, ৪. ইলামবাজার, ৫. কাঁকরতলা, ৬. কীর্ণাহার, ৭. লাভপুর, ৮. মহম্মদবাজার, ৯. মল্লারপুর, ১০. মাড়গ্রাম, ১১. ময়ূরেশ্বর, ১২. মুরারি, ১৩. নলহাটি, ১৪. নানুর, ১৫. পাঁরুই, ১৬. রামপুরহাট, ১৭. সদাইপুর, ১৮. সাঁইথিয়া, ১৯. সিউড়ি, ২০. তারাপীঠ, ২১. রাজনগর, ২২. খয়রাশোল, ২৩. লোকপুর, ২৪. চন্দ্রপুর।

পূর্ব সিংভূম—

১. মুসাবনি, ২. মানগো, ৩. সোনারি, ৪. বীরসানগর, ৫. বাগবেড়া, ৬.পটমদা, ৭. কদমা, ৮. সাকচি, ৯. চাকুলিয়া, ১০. বিষ্টুপুর, ১১. গোবিন্দপুর, ১২. গালুডি, ১৩. বহড়াগোড়া ইত্যাদি।

পশ্চিম সিংভূম—

১. সাসুন রোড, ২. লস্কর, ৩. মঙ্গলদাস, ৪. সোলাপুর বাজার, ৫. গণেশপীঠ, ৬. পুলগেট, ৭. আহাতু, ৮. ঝিঁকপাণি, ৯. চক্রধরপুর, ১০. টকশো, ১১. হাটগামারিয়া, ১২. জগন্নাথপুর, ১৩. গুয়া, ১৪. করাইকেল্লা, ১৫. বাঁধগাঁও, ১৬. সণুয়া, ১৭. গোয়েলকেরা, ১৮. মাঝগাঁও, ১৯. টেবো, ২০. গুড়রি, ২১. কুমারডুঙ্গি, ২২. টনটো, ২৩. জেটিয়া, ইত্যাদি।

ময়ূরভঞ্জের উল্লেখযোগ্য থানাগুলি হল—

১. বাদামপাহাড়, ২. বাদশাহী, ৩. বাহলডা, ৪. বারিপাদা সদর, ৫. বারিপাদা, ৬. বিশোই, ৭. চান্দুয়া, ৮. জামদা, ৯. যশিপুর, ১০. করঞ্জিয়া, ১১. কুলিয়ানা, ১২. খুন্তা, ১৩. মোরদা, ১৪. শরৎ, ১৫. উদলা, ১৬. শূলিয়াপাদা, ১৭. ঠাকুরমুণ্ডা, ১৮. রাসগোবিন্দপুর, ১৯. ঝাড়াপোখারিয়া।[১০]

আমাদের আলোচ্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার ভূমিপুত্র মহিলা কবি অর্পিতা কুণ্ডু যেসমস্ত কাব্য রচনা করেছেন তা আমরা আলোচনা করব।

ড. সুভাষ অধিকারীর লেখা ‘বাঁকুড়ার কবি সমাজ’ গ্রন্থে বাঁকুড়া জেলার কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু কবি অর্পিতা কুণ্ডুর কথা তিনি উল্লেখ করেননি। আমাদের আলোচ্য মহিলা কবি অর্পিতা কুণ্ডু। কবির জন্ম ১ মে ১৯৮৩। বাঁকুড়া জেলার ভূমিপুত্র কবি অর্পিতা কুণ্ডু। বর্তমানে তিনি মেদিনীপুর নিবাসী। কবির পিতার নাম অমিত কুণ্ডু ও মাতার নাম মঞ্জুলা কুণ্ডু। কবির স্বামীর নাম সৈকত সরকার, ছেলের নাম নালক সরকার।

কবি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কবির পেশা শিক্ষকতা আর কবিতা লেখা কবির নেশা। কবি শৈশব থেকেই কবিতা রচনা করেন কিন্তু নিয়মিতভাবে কবিতা লেখেন ২০০৭-২০০৮ সাল থেকে। কবির লেখা প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে অহর্নিশ পত্রিকায়। ২০১২ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় কবিতা ছাপা হতে থাকে। কবি নিয়মিতভাবে কবিতা লিখেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। যথা— ‘কৃত্তিবাস’, ‘দেশ’, ‘অহর্নিশ’ পত্রিকায়। বিভিন্ন সময়ে বাংলা কবিতা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুদিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ‘মিউজ ইণ্ডিয়া’তে।

কবি অর্পিতা কুণ্ডুর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত বই—

১. ‘গাঙ্গেয় যমুনার তীরে’ (২০১৭),

২. ‘পরিযায়ী... প্রত্নতাত্ত্বিক’ (২০২১),

৩. ‘পুড়েছে নাম ময়ূর আহরণে’ (২০২৪)।

এছাড়া কবি বেশ কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধন লিখেছেন। যথা—

১. ‘পিনাকী ঠাকুরের লিখনে রবীন্দ্রনাথ:একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ’, পিনাকী ঠাকুর বিশেষ সম্পাদন, অরূপ আস, ২০২৪

২. ‘এক সূর্য সহস্র জন্মায়’, ‘জয় গোস্বামীর ‘সূর্য পোড়া ছাই’ কাব্যগ্রন্থকে নিয়ে লেখা, অরূপ আস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, ভাষালিপি পত্রিকায়, প্রকাশক- মাল্যবান আস, তাঁতঘর, ধনিয়াখালি, হুগলী, সূচক- ৭২২৩০৩

৩. ‘বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা’, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩, সম্পাদনা- সঙ্গীতা বন্দোপাধ্যায়, এস.এস. প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

৪. ‘আবার সে প্রেমে ভুগবে, আবার আবার’- ‘শুধু বিঘে দুই’ পঞ্চম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৭, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুদ্রণ, শান্তি মুদ্রণ কলকাতা ৭০০০০৯,

৫. ‘সংযুক্তা বন্দোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ ১: এক স্বতন্ত্র নারী ভাষ্য’ বইকথা, পৌষ ১৪৩২, অষ্টম সংখ্যা

পুরস্কার:

‘গাঙ্গেয় যমুনার তীরে’ (২০১৭) কাব্যগ্রন্থের জন্য ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মান ও কৃত্তিবাস পুরস্কার পান।

শূন্য দশকে একজন উল্লেখযোগ্য বাংলা মহিলা কবি। যিনি পাঠক মহলে পরিচিত লাভ করেছেন বাংলা কবিতায় নতুন আঙ্গিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক শৈলীর জন্য। ধানসিড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছে কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘গাঙ্গেয় যমুনার তীরে’ (২০১৭)। প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধ্রুপদী কবি অর্পিতা কুণ্ডু কবিতা লেখার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নে যত্নশীল। কবির লেখা ‘গাঙ্গেয় যমুনার তীরে’ কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই গ্রাম- মফস্বলের জগত থেকে চিরন্তন ভালবাসার প্রবাহ। প্রেমে- আশ্লেষে প্রকৃতিবোধে জড়িয়ে থাকা জীবনের চলচ্ছবি। এক ছদ্মবেশী মনের অধিকারী কবি। কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে বিশুদ্ধ বিরহ। সেই বিরহ কখন লেখা হয় নদীতীরে, সাধনা শিবিরে, বাউলের গলায় গলায়। কবির কবিতার যাত্রাপথ শুধুমাত্র আখড়াতেই সীমায়িত নয়, অদেখা চোখের টানে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগরে সুর থেকে সুরে ঘুরে বেড়ায়। এই ঘুরে বেড়ানোর পথে কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না আমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমাজের বাস্তব অভাব-অনুভূতিকে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কবির বিভিন্ন কবিতায়। যেমন- সাইকেল, জাহাজ। এমনকি কবির কবিতার বিষয়বস্তুতেও বাদ যায়না প্রত্যন্ত হাভাতে রমণীর কথা। একাত্ম মাতৃরূপ ফুটে উঠেছে কবিতায়।এ-ও এক ভালোবাসা। যে ভালোবাসা কবি মাধুকরী করে এবং তাকেই আবার ছড়িয়ে দেয়। কবির এই কাব্যগ্রন্থটি টুকরো টুকরো ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি।

‘দূরের দুপুর’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন—

“ভাঙা মরাইয়ের পাশে ডাঁই করে রাখা
হাজার হাজার শব্দ-শয়ে শয়ে আনন্দবাজার
লাল মলাটের গায়ে
চই-চই হাঁস, খেত, বিরোধী-সরকার”

বিরহ যন্ত্রণার কথা কবি ‘লিখন’ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

“বন্দরে নৌকারা ভেড়েনি এখনও
কয়েকটি দূরগামী ঢেউ আগে এসে
প্রস্তুত করেছে তার পথ-
দীর্ণ জানালায় আমার বয়স
একা এসে দাঁড়িয়েছে।”

তিনি আবারও দেখিয়েছেন—

“হাত ছেড়ে
আমার বসন্তরেখা
চলে যাচ্ছে দূর”

বিরহের কথা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ‘প্রেতজ কলম’ কবিতায়—

“নিজেকে নিয়তি ধরি
কারও কারও ফেলে আসা পথে
পাথর সরিয়ে ফুল, ফুলের আড়ালে হিমহাড়
রেখে আসি।”

মাতৃস্নেহের কথা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ‘স্বপ্নদোষ’ কবিতায়—

“যেভাবে আদর হব, যেভাবে রাতের পরে দিন
মাঠে মাঠে পড়ে থাকব, প্রণয়ে প্রণয় ভরা আঁখি
ছুড়ে ফেলব আচ্ছাদন, ছুড়ে ফেলব যা-যা কিছু ঋণ
শঙ্খলাগা স্বপ্ন- যাকে বুকের গভীরে বেঁধে রাখি”

দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন কবি তাঁর ‘লয়কারি’ কবিতায়—

“আমি ও আমার এই লাশ
হতভাগ্যের হাতে হাত রেখে ঘুরি
বাতাসিয়া দিন যায়,
এলোচুল দুপুরের বুড়ি
আমাদের কিতকিত খেলাঘরে
ঘুঁটি আর বাক্স সাজায়”

কবি ‘জাতিস্মর’ কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন—

“বেঁচে আছি বলে জানি, এমনও তো ছিল দিন-
চোখের নীরব ঘুম উড়ে এসে চুপ বসতো বালিশের পাশে
যেখানে রাতের ঘোর রক্ত-গ্রন্থিময় শরীরের লাশে”

কবি আবারও দেখিয়েছেন—

"যত্ন করে; যত্নের অছিলায় রোমকূপ থেকে ফিরে যাবে
দানাদার রোদ, আঘাটায় পড়ে যার মৃত্যু এসেছিল-"

ধানসিড়ি প্রকাশিত হয়েছে কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পরিযায়ী... প্রত্নতাত্ত্বিক'(২০২১)।প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন সৌরীশ মিত্র। কাব্যগ্রন্থটি তিনটি উপশিরোনামে বিভক্ত আছে। এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে এক দমবন্ধ ডুব ও ভেসে ওঠা। ঘর ও বাহির থাকা বা না থাকার কারণে ডুবুরির এই খোঁজ বারবার বারবার প্রত্নচিহ্নে এঁকে দিয়েছে। কবি ও পাঠকের অস্তিত্ব মনকে অক্ষরের ছদ্মবেশ, খননের রক্তপাত একাকার করে দেয়। অস্তিত্বের আকুল জিজ্ঞাসাই এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোকে পরিযায়ী থেকে আস্তে আস্তে প্রত্নতাত্ত্বিক করে তুলেছে।কবি তাঁর 'মাটি' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

"এই তরবারি যেন একাকী হাজার কোলাহল
শেষপ্রান্তের দাগে ঘর পাতে প্রবীণ বয়স
ছেড়ে বা এসেছি কাকে, সেই দাগ কবেই মিটেছে
এমন দিনের শেষে সত্যি কি তাকে বলা যায়?"

আবারও আমরা দেখতে পাই 'সংশয়' কবিতায়—

"বিস্তার সে-পঞ্চকোশ, বৈভব সে-সনাতনী মূল
যার কণ্ঠ, তাকে দিই আকন্দের সুললিত মালা
শব্দহীন, গন্ধহীন, স্পর্শাবধি শিখাটুকু জ্বালা -
ঘৃতকল্প শেষে শিখি, এই সার।"

ধানসিড়ি থেকে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুড়েছে নাম ময়ূর আহরণে' প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থটিতে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন নিছক প্রেম নয়, নিছক প্রকৃতিও নয়— অথচ ভালোবাসা আর গ্রাম-মফসসলের কাহিনী। ভালোবাসে বলেই যেখানে আসে শ্লেষ, তির্যকতা। আসে মরা নদী, চায়ের দোকান, চলে-যাওয়া গায়কের ডুবকি-আর তার সঙ্গেই অলীক ভোটকর্মী, রাঙা ব্রেকফাস্টের স্ট্রিপটিজ এবং সর্বোপরি, এক অমোঘ উচ্চারণ, 'কবিধর্ম চুপ থাকা'। এই চুপ করে থাকার মধ্যেই আমরা কবির কবিধর্ম খুঁজে পাই। যে-কবিধর্ম আহত হতে হতে তৈরি করে শ্লেষের বর্ম, যে-কবিধর্ম ভালোবাসতে বাসতে নিষেক-শয্যার মধুছাপগুলি সঞ্চয় করে রাখে। এ বইয়ের কবিতাগুলি প্রভাবমুক্ত, নিজে নিজে তৈরি করা নিখুঁত ছন্দের ঘর। এইসমস্ত ছবিই কবি তুলে ধরেছেন তাঁর 'পুড়েছে নাম ময়ূর আহরণে' কাব্যগ্রন্থটিতে।

কবির কবিতা ধ্রুপদী, শব্দ ব্যবহারে যত্নশীল এই কবির কবিতায় পাওয়া যায় গ্রাম-মফস্বলের জগৎ থেকে চিরন্তন ভালোবাসার প্রবাহ, প্রেমে-আশ্লেষে-প্রকৃতিবোধে জড়িয়ে থাকা জীবনের চলচ্ছবি। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় কবির উল্লেখ "তুমি তো রক্তের মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছ তোমাকে!"। আমাদের কবিতা পড়ার শুরু এই উচ্চারণ থেকেই। কবিতার এক জগৎ নির্মাণে তিনি পটু, তাঁর কবিতার ভাষা প্রত্যয়ী। আপাত শান্ত শব্দের সঙ্গে শব্দের ঘর্ষণে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর কবিতা। যেমন এই বইয়ের এক কবিতায় ধরা পরে তাঁর কবিতার দিকমুখ। কবিতাটির নাম "একটি নির্লিপ্ত কবিতা"।

"একটি নির্লিপ্ত কবিতা আমি লিখি
লিখি ঘুম, মগ্নতার ধুলো বেয়ে উঠে আসা গ্রাম
আশ্চর্য মন্দির সে-গ্রামের! শূন্যতার, রুক্ষতার ভাষা বোঝে
যেই অযুত প্রহর, ফেলে আসা মাটি খাল বিল;
জীবনানন্দীয় পথে পড়ে থাকা ফসলের স্তূপ—
আমি সন্তর্পণে তার মধ্যে ঢুকে বসি

মেঝের আলোয় সোনা ধান ঝলমল করে, ঝলমল করে ওঠে
নিয়তি করাল, ফাগুন দুপুরে শিস দেয়
যে-সকল বঞ্চনার দুরূহ উত্তর কখনও লিখিনি, চুপিসারে"

কি যে আশ্চর্য এক উচ্চারণ! কবিতাপাঠকের সঙ্গে কবিও তাঁর কবিতায় মগ্ন, কবিতা নির্মাণের অনুসঙ্গ ধরা পড়ে এই লেখায়।

আরেকটি কবিতা। কবিতাটির নাম "দেবী"। আমরা লক্ষ্য করব এই কবিতায় পরিমিতির নিদর্শন, শব্দের কৃপণ ব্যবহারে ফুটে ওঠা এক অজ্ঞাত অবয়ব। এক অপুর কবিতা, আবাহনের, রহস্যময়ী দেবীর রূপ তাতে প্রকাশমান।

আমরা দেখতে পাই পুলিশে পুলিশে ম্লান জুতোর ধুলো। বিবর্ণ তারা যত যেখানে যেভাবে ছিল ভেঙে ছত্রখান—

"কুড়িয়ে চলেছি তাও ঝুড়ি ভরে তাদেরই আতপ-ঘোর রক্তদাহ
দানপাত্র দাও, মহামায়া, পাড়ার মণ্ডপে আজ দু-চোখে দু-কানে
তুলি স্বর্ণময়ী চালচিত্র, তোমাকে, আশ্চর্য দিন, তুলে রাখি রতি,
কাম, তমসা মন্থনজাত চণ্ডীর আদলে, এই ব্যর্থ কারাগারে"

এর পাশাপাশি রেখে পড়া যাক আরেকটি কবিতা 'অপরা' সিরিজের তৃতীয় কবিতাটি—

"রক্ত নয়, রক্তশিখা পেখমে বেঁধেছি শিখী
কটিবন্ধ সার
কুঞ্চিত কুৎসার কালে যে বটিকায়
বিনষ্ট হত আলেয়া পল্লব
আঁখি থেকে তার ক্ষুদ্র মনোহর
পড়ে গিয়ে ভেসে গেছে শূন্যের দুয়ারে

হেন যে উপায়ে এসে বুকে তুলি
মৃতের সন্তান, নির্বংশ বলে যাকে
পাকশালে ক্রমশ বেঁধেছি
নুনের অঙ্গীকারে হাতেপায়ে ঢেলেছি রন্ধন

আজ তার সর্বরোগহর—
আজ তার মণীন্দ্র-ইন্ধন দ্যাখে
জন্ম থেকে কোন কোন মাতৃক্রোড়ে কার
অন্ধকূপ ভেদে এসে পড়ল তৃণাঞ্চল
কার শ্বেত দুরাশার কবচকুণ্ডল
হেথা ফেলে গেছি গঙ্গা ক্ষীরতটে

অনন্তকালের প্রথা কার কূলে কার প্রতিফলে
ধীরে ধীরে বিযুক্ত করে যৌবন
প্রলম্বিত করে গেল পরিধি আমার"

এমন কবিতার সামনে নতজানু হই, দেবীদর্শন হয়। কবির এই কবিতায় যে শব্দের প্রয়োগ করেন, যে উচ্চারণের অভিঘাত, তার আবহ পাঠককে আবিষ্ট করে। অপূর্ব এই কবিতা। বারবার ফিরে পড়ার কবিতা, সঙ্গে থাকারও।

আরেকটি কবিতা 'ধায়!' অসামান্য একটি কবিতা—

'আমার সমস্ত স্রোত, আমার সমস্ত ধারা এমনি চলে যায়
এক শীতল কামনায় ।
মলিন পৃষ্ঠের দিকে ছায়া ছায়া মাঠ
একচ্ছত্র বনেদি সম্রাট, ঊর্ধ্ববাহু, নিমীলিত মুখ
অকলঙ্ক জল তার গাত্র বেয়ে নেমে পরাঙ্মুখ
দক্ষিণে দক্ষিণে চলে, শ্যাম শস্য সোহাগে পঞ্চম
আমি তার সুবর্ণ সক্ষম নারী,
দীর্ঘ ব্রতে ধরে রাখি পথ, অর্ধ আলো,
আবছায়া রথ পূর্বাপর বামে, আরও অন্ধকারে
থামে; সামান্য কাঞ্চনমূল্যে পারাপার চায়!

আমার সমস্ত স্রোত, ব্রহ্মাণ্ডসহায়
সূর্যপটে ডুব দেয় শব্দহীনতায়'

"বিকল্প" নামে একটি কবিতার সিরিজ আছে এই বইয়ে, তার সপ্তম কবিতা। কবিতায় যেন কবি উপস্থিত, যিনি অতি জীর্ণ শব্দে গাঁথেন কবিতার ভগ্ন কলেবর, কিন্তু তা হয়ে ওঠে অপরূপ।

এমনই আরেকটি অনায়াস ছন্দের কবিতা 'উচ্চারণ'। কি যে নির্ভর, সাবলীল! এই কবিতার চলন থেকে কবিতার মুহূর্ত নিখুঁত। কবিতার বোবা মাঝির বৈঠা বাওয়া দেখতে পাই মনের চোখে, যে মাঝি শোকের সঙ্গে আগুনও বাইছে।

"অন্ধ নামে তেলের কুপি জ্বলে
গণ্ডগ্রামে ময়ূর তুলোধুনো
বোবা মাঝির বইঠা অনর্গলে
শোক বাইছে, বাইছে সে আগুনও

ঝরা পালক, মরা পালক বনে
স্তূপীকৃত, প্রমাদ গোনে কেকা
পুড়েছে নাম ময়ূর আহরণে
বাক ফুটেছে বিন্দু... বিন্দু... রেখা"

কবির কবিতার নির্মাণে আরেকটি দিক উল্লেখ করার মতন, তা হলো উনি কবিতার নির্মাণে এমন সব বাঁক আনেন তা অকল্পনীয়। যেমন "মনসিজ" কবিতাটি। এই কবিতার সূচনা থেকে কবিতার গড়ে ওঠার পর্যায় বিস্মিত করে, তার আঙ্গিকে ও ভাষার প্রয়োগে। কবির কবিতা ভাষা স্বকীয়। নিজের আঙ্গিক নির্মাণ করেছেন তিনি আর সেই স্টাইল বদলে বদলে যায়।

"না না আস্থা, চিরআস্থা তুমি,
এমন ভ্রূকুটি আর কোরো না আমার আবেদনে

তোমার পতঙ্গসম লোভ হই, ক্ষুধা হই
মারণের হই সুকৌশল...
না না আস্থা, শতআস্থা তুমি, নির্ণীত মন্থনে বাঁধা জল

দীপ যায়, অস্ত যায় রাগিণী প্রহর
আমার অদম্য স্রোতে স্তব্ধ চরাচর শোনে
তিলমাত্র, কণামাত্র ক্লেদ কোথাও রাখিনি আমি স্বয়ম্ভু সমীরে
দ্যাখো, শতক বসন্ত তীরে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, শ্বেত
স্খলনের, ছলনের সে-বেশভূষায় নিরেট পৃথিবী তার
বীণা থেকে মূল তারগুলি খুলে খুলে ফেলে!
জানকীর সেই রথ, সেই তো আমার কবে থেকে...
জোছনা-তিমিরে অবিচল গেঁথে রাখি মীন রত্নরাজি
ও চঞ্চল, এখনও হয়নি শেষ প্রহর তোমার,
এখনও সে ভাঙা বরমালা ভেসে যায় উজান গঙ্গায়!

না না আস্থা, শুভআস্থা তুমি,
সুমুখে আগুন রেখো, এই শ্বাস
অগ্নিময়, দীপ্তিময়, জ্বালাময় কোরো অবিরল....”

আরেকটি কবিতা, কবিতার নাম ‘শ্লোক’। চুপ থাকা কবিধর্ম, শ্লোকের উন্মেষে যার প্রকাশ তা লক্ষ্য করি, কবিতাতেই।

আরেকটি কবিতা দিয়ে রাশ টানা যাক এই বইপরিচয়ের। এই কবিতাও কবির নির্মাণ ও সৃষ্টির দিক নির্দেশ করে। অনন্ত নক্ষত্রমালার ক্ষুধিত অক্ষর কবিকে সৃষ্টিশীল রাখুক, সৃজনক্ষম রাখুক প্রতিনিয়ত। আর তাঁর হাতে জন্ম নিক কবিতার নতুন পরিচয়।

“আমারও তো অনেকগুলি স্বর! ভিন্নমাত্রার ব্যবধানে
তাদের জীবিত করে রাখি। তাদের সচল আয়ু
লুক্কায়িত রেখে স্তনে, কখনও ব্রীড়ায় অধোমুখ—
ডেকেছি পার্বণ, তুমি এসো, তুমি আনো অন্ধকার

আমি গলা চিরে পান করি রুধির তোমার...
পুরাণের যুগ থেকে আরও পুরাতন যুগে ফিরি
শ্বাস বন্ধ, ঊর্ধ্বে আঁখি, আরও ঊর্ধ্বে হেঁটমুণ্ড আমি
গলায় গর্দান ধরি, ব্রজবালা অঙ্গে ধরি স্বর

তোমার বুকের ‘পরে জঘন রেখেছি, ঊরু, ভর—
ছিটকে ছিটকে ওঠে গলামধ্যে, অনন্ত নক্ষত্রমালা
ক্ষুধিত অক্ষর...”

কবি অর্পিতা কুণ্ডুর কবিতায় বিরহ, প্রেম ও ভালোবাসা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। কবিতায় সমাজের বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে কাব্যকে করেছেন অনন্য। কাব্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই কবি অর্পিতা কুণ্ডু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড-প্রাচীন যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা.লি., ১১৯, লেলিন সরণী, কলকাতা-১৩, দশম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৪ পৃ. ১

২. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম দে'জ সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪১৬, পৃ. ৬৭-৬৮

৩. তদেব, পৃ. ১০৪

৪. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ২০

৫. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম দে'জ সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪১৬, পৃ. ২৩-২৪

৬. তদেব, পৃ. ৪৪

৭. তদেব, পৃ. ৫৭

৮. দাশ বিনোদশঙ্কর, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ১৯৮৯, পৃ. ১১

৯. সাহা ধীরেন্দ্রনাথ, ঝাড়খন্ডী লোকভাষার গান, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১, প্রথম প্রকাশ, ২১ ফেব্রুআরি, ১৯৭১, পৃ. ৩

১০. ঘোষ ফটিক চাঁদ, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২০, পৃ. ১২-১৩

১১. কুণ্ডু অর্পিতা, গাঙ্গেয় যমুনার তীরে, ধানসিড়ি, শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্রকাশিত ও বসু মুদ্রণ ১৯ এ, শিকদারবাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত।

১২. কুণ্ডু অর্পিতা, পরিযায়ী... প্রত্নতাত্ত্বিক, ধানসিড়ি,শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্রকাশিত ও বসু মুদ্রণ ১৯ এ, শিকদারবাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত।

১৩. কুণ্ডু অর্পিতা, পুড়েছে নাম ময়ূর আহরণে, ধানসিড়ি,শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০০৫০ থেকে প্রকাশিত ও বসু মুদ্রণ ১৯ এ, শিকদারবাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত।

Citation: **Mahata. R.,** (2025) "দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মহিলা কবি : অর্পিতা কুণ্ডু", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.